বীর শহীদ পীরেন স্নালের রক্ত বলে যায় নিরন্তর সংগ্রামের কথা

২০০৪ সালের ৩রা জানুয়ারি মধুপুর শালবন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষার সংগ্রাম করতে গিয়ে পুলিশ-বনরক্ষী-ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন পীরেন স্নাল। এরপরও চলেশ রিছিল নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আরও অনেকে। সরকার বদলেছে কিন্তু বনপ্রাণ ধ্বংসের নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই পীরেনদের সংগ্রামও শেষ হয়নি। ২০১৮ সালের এইদিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিহত হলেন মিঠুন চাকমা। এই লেখায় উন্নয়নের নামে বনগ্রাসী বিভিন্ন প্রকল্প আর সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে বনবাসী মানুষদের প্রতিরোধের কথা।

১. শালবন কোচ, বর্মণ, মান্দি জাতির হা.বিমা

টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একসময় ছিল শালবনে আচ্ছাদিত মধুপুর গড় এলাকা। এই শালবনে হাজার হাজার বছর ধরে মান্দি, কোচ, বর্মণ প্রভৃতি জাতিসত্তার লোকজন বসবাস করে আসছে। এই শালবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তাদের বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনাচার। শালবন মান্দি জাতির হা.বিমা। এই হা.বিমা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র। বলশাল ব্রিংয়ের নানা প্রজাতির গাছপালা, তরুলতা, পশুপাখি–সব কিছুর সাথেই গড়ে উঠেছে তাদের অকৃত্রিম সখ্য। কেননা মান্দিরা বিশ্বাস করে যে, এই ব্রিংয়ের যত গাছপালা, পশুপাখি–সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে মিদ্দি বাগবার পবিত্র চিপাংফাকছা থেকে। একসময় শালবনের ভেতরে নিজস্ব রীতিতে হাবাহু.আর মাধ্যমে ঘরে তুলত ফসলাদি। কোনো অভাব-অনটন তেমন ছিল না। শালবনে বিচরণের ক্ষেত্রে বা ফলমূল সংগ্রহ বা হাবাহু.আর জন্য কারো কাছে কোনো অনুমতির প্রয়োজন পড়ত না। কেউ একবার কোনো জংলা জমি পরিষ্কার করে যদি জুম আবাদ শুরু করত তাতেই ওই জমির ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেত। অন্য কেউ তখন আর ওই জমির ওপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনোরূপ চেষ্টা করত না। এটাই ছিল সমাজের নিয়ম, যা চলে আসছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। কিন্তু এরপর একে একে পাল্টাতে থাকে শালবনের ওপর আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকারের ধরন-ধারণ।

ব্রিটিশ জমিদারি প্রথার মাধ্যমে মধুপুর গড় নাটোরের রাজার অধীনে আসে। নাটোরের রাজার শাসনাধীন হওয়ার পর মান্দিরা শালবনের নিচু জমি নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করে নিতে এবং উঁচু জমিতে লিজের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে পারত। ১৮৭৮ সালে ধানি জমি ভারতীয় প্রজাস্বত্ব আইনে নথিভুক্ত করা হয়, যার আওতায় বছর বছর তারা নিয়মিত কর প্রদান করে থাকে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শুরু হয় নানান প্রকল্প-প্রক্রিয়ায় শালবনেরই সন্তান মান্দি, কোচ, বর্মণদের উচ্ছেদ করার নিত্যনতুন আয়োজন। আর এইসব আয়োজন-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মান্দি, কোচ, বর্মণরা লড়ে গেছেন অসীম সাহসিকতায়। নিজ জননী ভূমিকে রক্ষার জন্য সেই ১৯৪৭ সালের পর থেকেই রচনা করে চলছিল একের পর এক প্রতিরোধের। আর এই প্রতিরোধ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ৩ জানুয়ারি গায়রা গ্রামে বহু যুগের নির্যাতন-নিপীড়নের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাদেরকে দাঁড় করিয়েছিলো ইকোপার্কের নামে হা.বিমাকে দেয়াল দিয়ে ঘেরার প্রতিবাদ জানাতে। 'খা সাংমা, খা মারাক' ধ্বনিতে দ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে, জড়ো হয়েছিল হাজার হাজার মান্দি, কোচ, বর্মণ জাতিসত্তার মানুষ। নিজেদের অধিকার এবং নিজ হা.বিমার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সমবেত হয়েছিল দেয়াল নির্মাণ রুখে দিতে। সেদিন হাজার হাজার আদিবাসীর বিপ্লবী চেতনাকে ম্লান করে দিতে বনরক্ষী ও সরকারি পেটোয়া বাহিনী পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন পীরেন স্নাল; আহত হয়েছিলেন উৎপল নকরেক, এপিল সিমসাং, শ্যামল চিরান, রীতা নকরেকসহ অনেকে। এই যে পীরেন স্নালের মৃত্যু বা আরো অনেকের আহত হওয়ার ঘটনা, তা কোনোভাবেই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শালবনের আদি বাসিন্দাদের উচ্ছেদ ও শালবনকে ধ্বংস করার জন্য বন বিভাগ বা শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক অমানবিক, নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের একটা অংশমাত্র।

এভাবেই নানান নিজস্ব রীতিনীতিতে তারা বনকে, বনের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করে আসছিল যুগ যুগ ধরে। বনকে ধ্বংস তো দূরে থাক, বনের সামান্যতম ক্ষতি করাকেও তারা মারাং বা দূষণীয় জ্ঞান করত। এই ছিল শালবনকে ঘিরে কোচ, মান্দি, বর্মণদের ধ্যানধারণা বা বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের বিপরীতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মাথায় সরকারের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মধুপুর শালবনের ওপর।

২. শালবন ধ্বংস এবং আদিবাসী উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার নাম ফরেস্ট অ্যাক্ট, রিজার্ভ ফরেস্ট, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, ন্যাশনাল পার্ক প্রকল্প, তুঁত চাষ, ফায়ারিং রেঞ্জ

যুগ যুগ ধরে শালবনে বসবাসরত কোচ, মান্দিদের কখনো বনের ওপর মালিকানা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়েনি। অন্যভাবে বলা যায় যে, মালিকানা শব্দটির অর্থই ছিল তাদের কাছে অজ্ঞাত। যে শালবনে তাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, বনকে ঘিরেই যাদের ধর্ম, আচার, সংস্কৃতি তার আবার মালিকানা কিসের। তারা তো বনের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো কাজ কখনো করেনি। বন থেকে যখন থারেং, থা.মান্দি সংগ্রহ করত তখন তো তারা পুরো গাছটাকেই উপড়ে তুলে ফেলত না; বরং কাঙ্ক্ষিত আলু বা কচু সংগ্রহের পর সেই গাছটি আবার সযত্নে মাটিতে পুঁতে দিত। বিভিন্ন আমুয়া(পূজা) বা অন্যান্য কাজে যখন ফুল-ফল, লতা-পাতার প্রয়োজন পড়ত তখন তো জঙ্গলের বা গাছের কাছে অনুমতি না নিয়ে তারা একটা জিনিসেও হাত দিত না। তারা তো বন থেকে কোনো জিনিস অবাধে লুটেপুটে নিয়ে কখনো বাইরে পাচার করেনি। বরং বনের জীববৈচিত্র্য যাতে অক্ষুণ্ন থাকে এজন্য মান্দিরা প্রতিবছর বর্ষাকালে পালন করত আসংদেনা আমুয়া। আমুয়ার দিন খামালের (পুরোহিতের) পেছনে পেছনে সবাই জঙ্গলে প্রবেশ করে একটা জায়গায় পূজার কৃত্যাদি সম্পন্ন করার পর সেখানে সবাই মিলে রোপণ করত নতুন গাছের চারা। এভাবেই নানান নিজস্ব রীতিনীতিতে তারা বনকে, বনের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করে আসছিল যুগ যুগ ধরে। বনকে ধ্বংস তো দূরে থাক, বনের সামান্যতম ক্ষতি করাকেও তারা মারাং বা দূষণীয় জ্ঞান করত। এই ছিল শালবনকে ঘিরে কোচ, মান্দি, বর্মণদের

ধ্যানধারণা বা বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের বিপরীতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মাথায় সরকারের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মধুপুর শালবনের ওপর। ১৯৪৯ সালের East Pakistan Private Forest Act (Act of 1950) এবং ১৯৫০ সালের East Pakistan State Acquisition and Tendency Act এর অধীনে 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ঘোষণার মাধ্যমে শালবনকে দখল করা হয়। এরপর বন বিভাগ কর্তৃক শুরু হয় কোচ, মান্দি, বর্মণদের ওপর একের পর এক উচ্ছেদ নোটিশ, জবরদখল, লুটপাট আর মিথ্যা মামলার হয়রানি।

ভারতীয় প্রজাস্বত্ব আইন রদ এবং এই আইনের আওতাধীন আদিবাসীদের রেজিস্ট্রিকৃত জমি বাজেয়াপ্ত করার প্রচেষ্টাসহ ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বন সেটেলমেন্ট অফিসার এস এইচ কোরেশী উচ্ছেদ নোটিশের ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৯৬২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আজম খান মধুপুর বনে ৪০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ২১ হাজার একর এলাকায়, যেখানে হাজার হাজার মান্দি বসবাস করছে, সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়। ১৯৬৮ সালে গভর্নর ও বনমন্ত্রী কোনো রকম ক্ষতিপূরণের আশ্বাস ব্যতিরেকেই চুনিয়া গ্রামের মান্দিদের প্রথম উচ্ছেদ নোটিশ এবং ১৯৬৯ সালে জাতীয় উদ্যান প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক চুনিয়া গ্রামে দ্বিতীয় উচ্ছেদ নোটিশ জারি করেন।

১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে শালবনের বাসিন্দারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাক সেনাদের বিরুদ্ধে। হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র, লড়েছিল জীবন বাজি রেখে। শহীদ হয়েছিল অনেক আদিবাসী নারী-পুরুষ। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের পরেও শালবনের আদিবাসীদের ওপর রাষ্ট্রীয় আচরণের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বনের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী আমলের সমস্ত কালাকানুনই থেকে যায় অপরিবর্তিত। ১৯২৭ সালের 'The Colonial Forest Act' পাল্টায় না, চরিত্র বদল হয় না বন বিভাগের, বনমন্ত্রীর বা রাষ্ট্রযন্ত্রের। মাঝে মাত্র তিন বছর বাদ দিয়ে ১৯৭৪ সাল থেকেই আবার পুরোদমে শুরু হয়ে যায় বনবাসীদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের রকমারি সব কৌশলের বহুমাত্রিক প্রয়োগ। মাঝেমধ্যেই নানান অজুহাতে ফলবাগান, ধানি জমি–সব কিছুই তছনছ করে দিয়ে যেত বন কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা। বনের অধিবাসীরা স্থানীয় থানায় মামলা করতে গেলেও সেই মামলা গ্রহণ করা হতো না।

১৯৭৭ সালে বন বিভাগ কর্তৃক শালবনের ভেতর কৃত্রিম লেক তৈরির নামে কোচ-মান্দিদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ন্যাশনাল পার্ক প্রকল্পের আওতাধীন এলাকায় হাজার হাজার বছর ধরে বসবাসরত অধিবাসীদের উচ্ছেদ নোটিশ জারি করে। একই বছর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ভেড়া চড়ানোর নাম করে শালবন এলাকার চাপাইদ গ্রামে আদিবাসীদের ভূমি দখল করে নেয়।

১৯৮১ সালে ময়মনসিংহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বিট অফিস প্রতিষ্ঠা ও তুঁতগাছ রোপণের নামে শালবনের মান্দিদের ১০৮ একর জমি দখল করে নেয় বন বিভাগ। আর এই দখলকার্যের জন্য বন বিভাগ প্রায় দুইশ বাঙালি মুসলমানকে জয়নাগাছা, বন্দেরিয়চলা, কেজাই গ্রামে নিয়ে আসে।

১৯৬২ সালের তৎকালীন গভর্নর আজম খান কর্তৃক ঘোষিত ন্যাশনাল পার্ক প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন ঘটে ১৯৮২ সালে স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলে। সরকারিভাবেই তখন মধুপুর গড়ের ২০,৮৩৭.২৩ একর বনভূমি নিয়ে মধুপুর জাতীয় উদ্যান ঘোষণা দেয়া হয়।

১৯৮৪ সালে আবার শালবন দখল হয় নতুন নামে নতুনভাবে। শালবনের পরিবেশ-প্রতিবেশের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবেই টেলকীপাড়া ও নয়াপাড়া গ্রামে বনকে ধ্বংস করে মান্দিদের নিজ জমিতে বিমান বাহিনীর জন্য ফায়ারিং রেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মান্দিরা সাথে সাথেই এর বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিল তাদের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিরোধ। কিন্তু এই প্রতিরোধে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি বন রক্ষার প্রতিষ্ঠান বন বিভাগ বা রাষ্ট্রযন্ত্র।

রাবারের মনোকালচারের জন্য ৭ হাজার একর জমি থেকে পুরো শালবন কেটে ধ্বংস করা হয়। মাটি থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয় শালগাছের কপিছ (Sal coppices), যা ওই এলাকায় ভবিষ্যতে শালবন সৃষ্টির প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকেও স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দেয়।

৩. শালবন ধ্বংস এবং আদিবাসী উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার নাম রাবার চাষ উন্নয়ন প্রকল্প, উডলট প্রকল্প

আন্তর্জাতিক সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (Asian Development Bank-ADB) অর্থায়নে দ্বিতীয় রাবার চাষ উন্নয়ন প্রকল্প মধুপুর শালবনে শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। শালবনের বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থাকে (ecological condition) বিবেচনা না করেই সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থে অবৈজ্ঞানিক ও জীববৈচিত্র্য (biodiversity) বিধ্বংসী এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এই রাবার চাষ প্রকল্পের জন্য ১৫ হাজার একর জমি প্রকল্প আওতাধীন ধরা হলেও বনের বাসিন্দাদের বিরোধিতার মুখে ৭ হাজার একর জমিতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। আর এই ৭ হাজার একর জমিও দখল করা হয় সেই পুরনো কায়দায়, অর্থাৎ মান্দিদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রাবারের মনোকালচারের জন্য ৭ হাজার একর জমি থেকে পুরো শালবন কেটে ধ্বংস করা হয়। মাটি থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয় শালগাছের কপিছ (Sal coppices), যা ওই এলাকায় ভবিষ্যতে শালবন সৃষ্টির প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকেও স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দেয়। পরে অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে পরিবেশবাদীরা এ ব্যাপারে সোচ্চার হলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকল্প বন্ধে বাধ্য হলেও শালবনের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়।

রাবার চাষ প্রকল্পের দুই বছর না যেতেই আসে পাঁচ বছর মেয়াদি (১৯৮৯-১৯৯৫) থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প, যা সোশ্যাল ফরেস্ট্রি (social forestry) নামে পরিচিত। এবার সেই একই আন্তর্জাতিক সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ৪৬.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প ব্যয়ের ১১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয় শালবন এলাকায় উডলটের পেছনে। মধুপুরের শালবনে এই উডলট প্রকল্পে শত শত একর জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয়া হয়। উডলটের ব্লক তৈরির জন্য দখলকৃত জমির কপিছসহ সমস্ত শালগাছ এবং হাজার হাজার প্রজাতির মূল্যবান ঔষধি গাছ সমূলে বিনষ্ট করা হয়। সেখানে লাগানো হয় Eucalyptus spp., Dalbergia sissoo, Leucaena leucocephala, Swietenia macrophylla Ges Cedra toona ইত্যাদি বিদেশি গাছ। উল্লেখ্য, এইসব গাছ সাধারণত মরু (barren) এলাকায় বনায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়। অথচ আমাদের এখানে হাজার হাজার বছরের পুরনো প্রাকৃতিক শালবন ধ্বংস করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রেসক্রিপশনে এইসব গাছ লাগানো হয়েছে। আর এই সব আয়োজনই

যে শালবনকে ধ্বংস এবং শালবনের আদিবাসী কোচ, মান্দি, বর্মণদের বিপন্ন থেকে বিপন্নতর করে দেয়ার দেশীয়-আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, তা বলাই বাহুল্য।

৪. শালবন ধ্বংস এবং আদিবাসী উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার নাম ইকোপার্ক প্রকল্প

৯৭.৩ মিলিয়ন টাকার মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের (Modhupur National Park Development Project) আওতায় ফরেস্ট কনজারভেশন ও ইকোট্যুরিজম স্কিমের সরকারি অনুমোদন লাভ করে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। পরবর্তীতে চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি, পশুপাখি ও বণ্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল নির্মাণের ভালো ভালো বুলি আওড়ে মধুপুর গড়ের প্রায় ৩ হাজার একর বনভূমি ঘিরে ৭ ফুট উচ্চতার ৬১ হাজার ফুট ইটের দেয়াল এবং ভেতরে ১০টি পিকনিক স্পট, ২টি ওয়াচ টাওয়ার, ২টি কালভার্ট, ৩টি কটেজ, জলাধারসহ লেক ৯টি, রেস্টহাউজ ৬টি, রাস্তা নির্মাণ ৬টি, বনকর্মীদের ৬টি ব্যারাক নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ২০০৩ সালের ৩ জানুয়ারি জালাবাদা, সাধুপাড়া, বেদুরিয়া, কাঁকড়াগুনি, গায়রা গ্রামে দেয়াল নির্মাণের জন্য বনকর্মীরা জরিপ কাজ শুরুর আগ পর্যন্ত সেখানকার আদিবাসীরা এই দেয়াল নির্মাণের ব্যাপারে তেমন কিছুই জানত না। অথচ এই প্রকল্পাধীন ভূমিতেই রয়েছে হাজার হাজার কোচ, মান্দির বসবাস। ইকোপার্কের নামে কোচ, মান্দিদের উচ্ছেদের এটা যে পুরনো উদ্দেশ্যেরই নব্য একটি প্রক্রিয়া তা আর বুঝতে বাকি থাকে না আদিবাসীদের। জানুয়ারির মাঝামাঝিতে মুক্তাগাছা থানার বিজয়পুর ও সাতারিয়া এলাকায় মান্দি গ্রামগুলোতে স্থানীয় মান্দিদের তীব্র প্রতিবাদের মুখেও বন বিভাগ প্রথম দেয়াল নির্মাণের কাজ শুরু করে। মান্দি, কোচ, বর্মণরা জানে এই ইকোপার্কের দেয়াল নির্মাণের ভয়াবহতা কত মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে তাদের জীবনাচারে। সংঘবদ্ধ হতে থাকে আদিবাসীরা। বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে তাদের দাবিসমূহ বিভিন্নভাবে সরকারের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে।

মিছিলটি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরপরই পুলিশ ও বনরক্ষীদের নির্বিচার গুলিবর্ষণ শুরু হলে ঘটনাস্থলেই নিহত হন জয়নাগাছা গ্রামের বিশ বছরের যুবক পীরেন স্নাল; গুলিবর্ষণে মারাত্মক আহত হন রবীন সাংমা, উৎপল নকরেক, এপিল সিমসাং, পঞ্চরাজ ঘাগ্রা, রহিলা সিমসাং, শ্যামল সাংমা, রিতা নকরেকসহ প্রায় ২৫ জন আদিবাসী শিশু-কিশোর-নারী-পুরুষ।

আদিবাসীদের আন্দোলনের চাপে তৎকালীন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী শাজাহান সিরাজ ২০০৩ সালের ৪ জুলাই দোখলায় আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসেন। আদিবাসীরা তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া মন্ত্রীর কাছে পেশ করে। অফলপ্রসু এক আলোচনার পর সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়, যে কমিটি ইকোপার্ক সংক্রান্ত উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রিপোর্ট পেশ করবে। মূলত এই প্রস্তাব ছিল সরকারের পক্ষ থেকে ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলনকে বানচাল করে দেয়ার একটা পাঁয়তারা। এই প্রস্তাব পেশ করেই তৎকালীন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী আদিবাসীদের যৌক্তিক দাবিদাওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছু না বলে চলে যান। পরবর্তীতে বন বিভাগ সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মান্দি, কোচ, বর্মণদের নিয়ে ইকোপার্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন, সেই সব প্রকৃত নেতাকে বাদ দিয়ে খ্রিস্টীয় মিশন প্রধান ও কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পর্যালোচনা কমিটি গঠনের পরিবর্তে মূলত ইকোপার্ক প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। সরকারের তৈরিকৃত বিশ্বাসঘাতক এই দালালশ্রেণী এর পর থেকে ইকোপার্কের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য কিছু অকার্যকর মিটিং-সমাবেশের আয়োজন করতে থাকে। সংগ্রামরত আদিবাসীরা এই চিহ্নিত দালালদের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে চালিয়ে যেতে থাকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, হা.বিমাকে রক্ষা করার সংগ্রাম। ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে গায়রাতে অনুষ্ঠেয় সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় ৩ জানুয়ারি ২০০৪ সালে ইকোপার্ক বিরোধী মিছিলের। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই ৩ জানুয়ারি ২০০৪ গায়রা গ্রামে সাধুপাড়া, কাকড়াগুনি, জয়নাগাছা, জালাবাদা, বিজয়পুর, সাতারিয়াসহ আশপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার আদিবাসী নারী-পুরুষ নিজেদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে শামিল হয়। 'খা সাংমা, খা মারাক' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো শালবন এলাকা। এদিকে সমাবেশ ও মিছিলের খবর পেয়ে সকাল থেকেই সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও অস্ত্রধারী বনরক্ষীদের এমনকি ঠিকাদারের ভাড়াটে লোকদেরও মোতায়ন করে রাখা হয়েছিল। সমাবেশ শেষে দুপুর বারোটার দিকে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলটি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরপরই পুলিশ ও বনরক্ষীদের নির্বিচার গুলিবর্ষণ শুরু হলে ঘটনাস্থলেই নিহত হন জয়নাগাছা গ্রামের বিশ বছরের যুবক পীরেন স্নাল; গুলিবর্ষণে মারাত্মক আহত হন রবীন সাংমা, উৎপল নকরেক, এপিল সিমসাং, পঞ্চরাজ ঘাগ্রা, রহিলা সিমসাং, শ্যামল সাংমা, রিতা নকরেকসহ প্রায় ২৫ জন আদিবাসী শিশু-কিশোর-নারী-পুরুষ। এই ঘটনার পরপরই আদিবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মাসব্যাপী চলে তাদের তুমুল বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ। এদিকে বন বিভাগ বা সরকার শুধু হত্যা ও আহত করেই থেমে থাকেনি।

৪ জানুয়ারি রাতেই নিহত পীরেন স্নাল এবং গুলিতে আহত উৎপল নকরেক, জর্জ নকরেক, শ্যামল সাংমা, মৃদুল সাংমা, হ্যারিসন সাংমা, বিনিয়ান নকরেকসহ অজ্ঞাত প্রায় ছয়শ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে মধুপুর থানার হাবিলদার বাদী হয়ে। এভাবেই বন বিভাগ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলন শুরুর পর থেকে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। শুধুমাত্র জুন ২০০৩ থেকে জুলাই ২০০৪ পর্যন্তই আদিবাসী নেতৃবৃন্দসহ নিরীহ অনেকের নামে বন বিভাগ বা সরকার মামলা দায়ের করে মোট ২১টি। এই ২১টি মামলার সবকটিতেই যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা হলেন অজয় মৃ, প্রশান্ত মানখিন, পঞ্চরাজ ঘাগ্রা, মালতি নকরেক, স্বপন নকরেক, নেরি দালবত, মাইকেল নকরেক, চলেশ রিছিল প্রমুখ। আর পীরেন হত্যার পর আদিবাসীদের পক্ষ থেকে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তা উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ নেই এই অজুহাত দেখিয়ে খারিজ করে দেয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত; অথচ গুলিতে গুরুতর আহত অনেকেই হুইলচেয়ারে করে আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছিলেন। শুধু তা-ই নয়,পীরেন স্নাল নিহত হওয়ার পরপরই বন বিভাগ ঘটনার দায়ভার এড়াতে রাতের অন্ধকারে শালবনের বিপুলসংখ্যক গাছ কেটে সরিয়ে নেয়, আর পরবর্তীতে গাছ চুরির মামলা ঠুকে দেয় নিরীহ

আদিবাসীদের নামে। এই হচ্ছে বন বিভাগ বা রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য রক্ষার নমুনা।

৫. খা সাংমা, খা মারাক

বন বিভাগ ও রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে এযাবৎকালে যতগুলো পরিকল্পনা-প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার কোনোটাই যে শালবনকে, শালবনের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষার জন্য নেয়া হয়নি, বরং সেখানকার আদিবাসীদের উচ্ছেদের মাধ্যমে শালবনের সম্পদ লুটপাট করার জন্য তা অতি স্পষ্ট। যে বন বিভাগ বন রক্ষার (?) মহান ব্রতে (!) নিয়োজিত সেই বন বিভাগের কর্মকর্তারা নিজেরাই কালোবাজারিদের সাথে আঁতাত করে শালবনের সম্পদ পাচার করে আর আদিবাসীদের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে চলে। টেলকী গ্রামের এক সিরিন নকরেকের বিরুদ্ধেই বন বিভাগ মামলা দায়ের করেছে প্রায় অর্ধশত। বনের গাছ চুরির অভিযোগে সিরিন নকরেক জেলে থাকাকালেও তাঁর বিরুদ্ধে গাছ চুরির নতুন নতুন মামলা হয়। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, জেলে থাকাকালেও একজন লোক কিভাবে বনের গাছ চুরি করতে পারে? এর সদুত্তর বনের বাসিন্দারা কখনো পায়নি বন বিভাগের কাছে বা রাষ্ট্রের কোনো প্রশাসনযন্ত্রের কাছে। তারপরও বনের বাসিন্দারা বারবার বন কর্মকর্তাদের গাছ পাচার বন্ধ করতে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়েছিল, চেষ্টা করেছিল শালবনের সম্পদ রক্ষা করতে। আর এর জন্য ১০ এপ্রিল ১৯৯৬ সালে জয়নাগাছা গ্রামের বিহেন নকরেককে দিনদুপুরে জীবন দিতে হয়েছিল বনরক্ষীর গুলিতে। বিহেনের অপরাধ ছিল ঘটনার দিন বনের ভেতর পাতা কুড়াতে গেলে সে বন বিভাগের গাছ চুরি দেখে ফেলে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এরপর উল্টো বন বিভাগের দায়েরকৃত গাছ চুরির মিথ্যা মামলায় আদালত রায় দেয়, বিহেনকে গুলি করা বৈধ হয়েছে কারণ সে বনের গাছ চুরি করছিল। অথচ বন আইনে গাছ চুরি করলেও কাউকে পেছন থেকে গুলি করার নিয়ম নেই। এই হচ্ছে শালবন ও বনের আদিবাসীদের ওপর বন বিভাগ বা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রহসনের বাস্তব প্রতিচিত্র। কিন্তু শালবনের যারা আদি বাসিন্দা, শালবন যাদের জীবন-ধর্ম-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেই মান্দি, কোচ, বর্মণরা কোনোভাবেই এই শালবনকে ধ্বংস হতে দিতে পারে না, নিজেদের অস্তিত্ব, জীবন, সংস্কৃতিকে কোনোভাবেই বিলীন হতে দিতে পারে না। আর সেজন্যই যুগে যুগে তারা লড়াই করে এসেছে সমস্ত ষড়যন্ত্র, কালো আইন, নির্যাতন-নিপীড়ন, মিথ্যা মামলা, উচ্ছেদ আর দেয়াল নির্মাণের বিরুদ্ধে। পীরেন স্নাল সেই সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করেই নিজ হা.বিমা ও নিজ জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিজের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন নিজ হা.বিমার বুকে। হা.বিমার বুক থেকে পীরেন স্নালের রক্তের যে আহ্বান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, সেই আহ্বানকে কখনো উপেক্ষা করতে পারে না হা.বিমার সন্তানরা। বিহেন নকরেক, গীদিতা রেমা ও বীর পীরেনের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করেই হা.বিমার সন্তানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, শালবন তথা হা.বিমাকে রক্ষার জন্য লড়ে যাবে নিরন্তর।

[এই লেখাটি নেয়া হয়েছে জাতিতাত্ত্বিক লোকায়ত জ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক কাগজ মৃত্তিকা থেকে। লেখাটি সম্পাদনা করেন জুয়েল বিন জহির, পরাগ রিছিল, দুপুর মিত্র। বীর শহীদ পীরেন স্নালের মহান আত্মত্যাগের এক বছরে বিশেষ পত্র, প্রকাশকাল : ২০ পৌষ ১৪১১ বঙ্গাব্দ, ৩ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।]

তথ্যসূত্র

১. Bangladesh Land, Forest and Forest People Editor-Philip Gain Published by- SHED, Dhaka.

২. সংহতি ২০০৪, সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, প্রকাশনায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বনানী, ঢাকা

৩. বিপন্ন ভূমিজ, অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ, বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতের প্রতিচিত্র, সম্পাদনা মেসবাহ কামাল, আরিফাতুল কিবরিয়া, আরডিসি, ২০০৩, ঢাকা

৪. মান্দিরাংনি চিঠি, সম্পাদক প্রশান্ত চিরান, ত্রয়োদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৩, প্রকাশনায় ফারাকা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

৫. আচিক, সম্পাদক অর্পণ যেত্রা, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৪, ঢাকা

৬. খোলা চোখ, সম্পাদক খোকন রিছিল, প্রকাশনায় প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ, ৪৩৪ জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০০৩, ঢাকা

৭. দৈনিক প্রথম আলো (৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১৩, ২৩, ২৭ জানুয়ারি ২০০৪ সংখ্যা), ঢাকা

৮. দৈনিক ভোরের কাগজ (২৭ জানুয়ারি ২০০৪ সংখ্যা), ঢাকা

৯. দৈনিক জনকণ্ঠ (২৫, ২৭ জানুয়ারি ২০০৪ সংখ্যা), ঢাকা

১০. সাক্ষাৎকার : আলবার্ট মানখিন, ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলনের নেতা

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ নেতা মিঠুন চাকমাকে গুলি করে হত্যা

গত ০৩ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় ইউপিডিএফের কেন্দ্রীয় সদস্য মিঠুন চাকমাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে জানানো হয়, স্লুইস গেইট এলাকায় বুধবার বেলা ১২টার দিকে তাকে গুলি করা হয়। স্থানীয়রা তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ইউপিডিএফের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বিজন চাকমা গণমাধ্যমকে বলেন, সকালে তাকে তার অপর্ণা চৌধুরীপাড়ার বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

হত্যাকারীদের এখনও সনাক্ত করা হয় নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খাগড়াছড়ি শহরে জড়ো হন হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু পুলিশ সেখানে লাশ নিয়ে যেতে দেয় নি। মিঠুন চাকমার বাড়িতে পূর্ণ অস্ত্র ও লাঠিসোঁটায় সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা পুলিশ প্রবেশ করে। বাড়ির বাইরে পুলিশ এবং গ্রাম পুলিশ অবস্থান নেয়, অন্যদিকে সারা শহর জুড়ে বিভিন্ন বাহিনীর টহল চলতে থাকে।

মিঠুন চাকমাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজন যাতে দলীয় কার্যালয়ে না করা হয় সে জন্য পুলিশ গিয়ে তার বাসায় মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়ে আসে! তাঁর সংগঠন অবশেষে বাসায় উপস্থিত কয়েকশ মানুষকে সাথে নিয়েই শবযাত্রা নিয়ে শ্মশান গিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।